অনিল ঘড়াইয়ের ছোটগল্পে প্রান্তিক নারীর অসহায়তা

ড. বিশ্বজিৎ মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের কাব্যপ্রতিমাকে অনিল ঘড়াই দান করেছেন গ্রামজীবন ও গ্রামজীবনের তৃষ্ণা। তাঁর লেখার মূল উপজীব্য নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষ, প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে সাহিত্যচর্চার সুবাদে তিনি অন্ত্যজ জীবনের রূপকার। আপাততুচ্ছ প্রবহমান জীবনের অন্তরালে আনন্দ-বেদনার যে উৎসব ঘটে চলেছে অবিরিত তা অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্যসৌন্দর্যে বাকময় হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। বাঁচার লড়াইয়ে হেরে যাওয়া, খেটে খাওয়া, হতদরিদ্র মানুষজনের প্রকৃত মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে তাঁর কথনবিশ্বে। তাঁর লেখায় যেসব নিম্নবিত্ত তথা বিত্তহীন মানুষদের কথা বলেছেন তারা নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে চিহ্নিত হলেও তাদের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক অবস্থানগত ঐক্য আছে; সবারই প্রধান অসুখ দারিদ্র্য, এ দারিদ্র্য আবার সারারও নয়। দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে, বিষয় বৈচিত্র্যে শিল্পী ছুঁয়েছেন যথাযথ সময়ের আঙিনা। কিন্তু রাঢ় বাংলার পটভূমিতেই তাঁর সাহিত্য সীমাবদ্ধ; পরিচিতি আঞ্চলিক সীমানার রূপকার।

সময়ের পথ ধরে অনিল ঘড়াইয়ের ছোটগল্পে উঠে এসেছে প্রান্তিক জনজীবনের নিভৃত আদল, অতি সাধারণ নারী-পুরুষই তাঁর কথনবিশ্বের উত্তম-সুচিত্রা। সীমাহীন দারিদ্র্য এবং প্রথাগত শিক্ষাদীক্ষাহীন প্রান্তিক মানুষগুলি অন্তরের নির্দেশে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ধর্ম-অধর্মের ধারণা থেকে হরেক কিসিমের বিশ্বাস-সংস্কারকে আশ্রয় করে অসহায় জীবন-যাপন করে চলেছে। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলিও বিশেষ মনোযোগের দাবিদার, তারা কখনো প্রতিবাদী, কখনো প্রেমিকা, কখনোবা আবার জায়া ও জননী। তবে যেভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন তাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি প্রকট সেটি হলো অসহায়তা। তাদের এই অসহায়তা যেমন নিজের দিক থেকে তেমনি আবার সামগ্রিক। 'নুনা সামাডের গল্পে'র কিশোরটির মা, 'ফুলের দেশে ফুলপরী' গল্পের পারুল-কনক-চম্পা-বিণতি, 'টিকলি' গল্পের টিকলি, চাঁদমনি, 'জার্মানের মা' গল্পের রম্ভাধাই, 'বীজ' গল্পের টুনিয়া, 'কাকমারা' গল্পের পার্বতী, 'পিঁপড়ের জীবন' গল্পের টগর, 'পুনশ্চ পরশুরাম' গল্পের সুনার ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে অসহায়। আবার 'পরিযান' গল্পের ময়না, 'বিলভাত' গল্পের পুতলি, 'গোলাপগাছ' গল্পের সারী চরিত্রের মধ্যে স্বামীর অবর্তমানে তাদের দুর্দমনীয় অসহায় অবস্থার চিত্র প্রকটিত উঠেছে।

প্রখর বাস্তববাদী, মানবদরদী লেখক শব্দের ছবিতে নিচুতলার মানুষদের চিত্রায়িত করতে ভালোবাসতেন, আজীবন করেছেনও তাই। মানুষের কাছে যাওয়াই ছিল তাঁর প্রিয় সখ, একমাত্র অঙ্গীকার মানুষগুলোর প্রতি। সেই মানুষগুলি, যাঁদের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন –'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের

Society Language and Culture

জলের কখনো হিসাব নিলে না ...'। এই প্রান্তিক, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষগুলির চরিত্র সুনির্দিষ্ট আবেগ অনুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্প বিশ্বে। প্রান্তিক অসহায় নারীর যে সব চালচিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অত্যন্ত অভিনব, বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে; গল্পকারের মানবিকতার উত্তুঙ্গ স্পর্শে তারা চিরকালীন।

সূচক শব্দ: অন্ত্যজ, প্রান্তিক, জীবনাচরণ, ভাগচাষি, দেহপসারিণী, ধাইমা, মুরুব্বি, কোবরেজ।

মূল লেখা: 'অন্ত্যজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নীচজাতি' হলেও ব্যাপকার্থে নিম্নবৃত্তিধারী বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষদের বোঝানো হয়ে থাকে। উচ্চবর্গের মানুষদের কাছে এরা চিরদিনই উপেক্ষার পাত্র। উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে 'নিম্নবর্গ' ধারণা বহুচর্চিত একটি বিষয় হলেও বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নজীবী মানুষদের কথা বিশ শতকের তিনের দশক থেকেই উঠে আসতে শুরু করেছিল কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায়। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনায় এইসব প্রান্তিক মানুষদের বিচরণ দেখেছি। উচ্চশ্রেণি কিংবা মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোন থেকে সেই দেখায় কোথাও যেন একটা রোমান্টিকতার অবকাশ ছিল। বিশ শতকের সাত-আটের দশক থেকে সেই ধারা আরো বর্ধিত হলো, এই দুই দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত সাহিত্যিকদের বেশিরভাগেরই অবলম্বন হয়েছে দেশের দরিদ্র শ্রেণির জনগোষ্ঠী ও বহু যুগ ধরে চলা তাদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবেই তাই লেখকদের ভাব-ভাবনা তথাকথিত নাগরিক জীবনকে ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে গ্রামীণ এলাকায়। ভগীরথ মিশ্রের কথায়, '... বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের গ্রামীণ ধারাটি, যা তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ও মানিকের পর শীর্ণ হয়ে পড়েছিল, (এই সময়ে) সহসা আবার তা বেগবান হল'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বিষয়গত ও প্রকরণগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিলো। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিশেষকরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উত্তর-ঔপনিবেশিক আখ্যানে যেখানে প্রান্তিক মানুষের নিরুদ্ধ স্বর উচ্চারিত হচ্ছিল; সেখানে বাংলা সাহিত্যেও তার আঁচ পাওয়া অসম্ভব নয়। ছয়-সাতের দশক ও তার পরবর্তী সময়ের লেখকরা শহুরে শিক্ষিত হলেও তাঁরা মুখ ফিরিয়েছেন প্রত্যন্ত গ্রামবাংলায়। কর্মসূত্রেই হোক বা অভিজ্ঞতার সূত্রে, তাঁরা দরদ দিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক মানুষের শোষণ-যন্ত্রণার পাশাপাশি পরিবর্তিত সময়ের প্রতিচ্ছবি সবকিছুই প্রবল গতিতে সাহিত্যে উঠে আসতে থাকে। কাজেই সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিত, সমীর রক্ষিত, নলিনী বেরা প্রমূখ আরো অনেকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অন্তে-বাসী মানুষের বেদনা; তাঁরাই সময়ের প্রত্যাশিত ফসলকেই সাহিত্যে তুলে এনেছেন আপন সন্তানস্নেহে। তবে প্রথমেই যাঁর কথা না বললে বাংলা সাহিত্যের এই নতুন অভিমুখ সঞ্চারের ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যায় তিনি হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখনি ভানুমতীর সেই অজ্ঞাত ভারত কথাকেই দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের কাব্যপ্রতিমাকে যিনি দান করেছেন গ্রামজীবন ও গ্রামজীবনের তৃষ্ণা, তিনি হলেন অন্যধারার গল্প লেখক অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪)। দলিত ও প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে সাহিত্যচর্চার সুবাদে তাঁকে অন্ত্যজ জীবনের রূপকার বলা হয়ে থাকে। বাঁচার লড়াইয়ে হেরে যাওয়া, খেটে খাওয়া, হতদরিদ্র

Society Language and Culture

মানুষজনের প্রকৃত মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে তাঁর কলমের আঁচড়ে। অনিল ঘড়াই তাঁর লেখায় যেসব নিম্নবিত্ত তথা বিত্তহীন মানুষদের কথা বলেছেন তারা নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে চিহ্নিত হলেও তাদের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক অবস্থানগত ঐক্য আছে; সবারই প্রধান অসুখ দারিদ্র্য, এ দারিদ্র্য আবার সারারও নয়। 'ইন্দ্রিয়-সজাগ দৃষ্টি' দিয়ে অনিল এদের দেখেন এবং 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশিত গল্প-সংকলনের ভূমিকায় সেটাই বলেছেন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে,

> আমি সেইসব মানুষকেই কলমে তুলে ধরার চেষ্টা করি, যারা সমাজে আজও নিচুতলার মানুষ হয়ে জন্মানোর অপরাধে অভিশপ্ত জীবন ভোগ করছেন ...।[১]

অনিল ঘড়াইয়ের লেখার মূল উপজীব্য নিম্নবর্গের মানুষ। অন্ত্যজ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যাওয়ার মধ্য দিয়েই লেখকের অভিজ্ঞতা শাণিত। তাঁর গল্পে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন ব্যপ্ত হয়ে আসে জীবনের বহু বিচিত্র রূপচ্ছবি নির্মাণের পথ ধরে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জেগে থাকে পাঠকের মনোলোকে। আপাত তুচ্ছ প্রবহমান জীবনের অন্তরালে আনন্দ-বেদনার যে উৎসব ঘটে চলেছে অবিরত তা অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্যসৌন্দর্যে বাকময় হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে, বিষয় বৈচিত্র্যে শিল্পী ছুঁয়েছেন যথাযথ সময়ের আঙিনা। কিন্তু রাঢ় বাংলার পটভূমিতেই তাঁর সাহিত্য সীমাবদ্ধ; পরিচিতি আঞ্চলিক সীমানার রূপকার,

> বিলাসিতার ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠিনি বলেই হয়তো আমার মনটা এখনও তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই, তথাকথিত সফিস্টিকেটেড মানুষ যাদের বলা হয় তাদের নিয়ে এখনও লিখতে পারিনি, এটা আমার অক্ষমতা।[২]

এই 'অক্ষমতা'-ই হয়তো এককভাবে চিনিয়ে দেয় তাঁর ক্ষমতার পরিসীমা – যেখানে আমরা প্রান্তিক জনজীবনের নারী-পুরুষ চরিত্রের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পেয়ে যাই।

সময়ের পথ ধরে তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে প্রান্তিক জনজীবনের নিভৃত আদল, অতি সাধারণ নারী পুরুষের কথাই উঠে এসেছে তাঁর কথনবিশ্বে। সীমাহীন দারিদ্র্য এবং প্রথাগত শিক্ষাদীক্ষাহীন প্রান্তিক মানুষগুলি অন্তরের নির্দেশে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ধর্ম-অধর্মের ধারণা থেকে অসহায় জীবন-যাপন করে চলেছে। আখ্যানে পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলিও বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রেরা কখনো প্রতিবাদী, কখনো প্রেমিকা, কখনোবা আবার জায়া ও জননী। তবে যেভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন তাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি প্রকট সেটি হলো অসহায়তা। তাদের এই অসহায়তা যেমন নিজের দিক থেকে তেমনি আবার সামগ্রিক। কথাকার অনিল ঘড়াই তাঁর ছোটগল্প সাহিত্যে প্রান্তিক নারীর হৃদয়হীন অসহায়তা কিভাবে কাহিনিপটে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াসই আলোচনার মূল লক্ষ্য।

'নুনা সামাডের গল্প'টি ষোল বছরের কিশোরের একদিনের অভিজ্ঞতার গল্প। গল্পটি উত্তরপুরুষে কিশোরের মুখ দিয়ে কথিত হলেও, কিশোরটির মা এই গল্পের বিবেক। মা প্রতিবাদী কিন্তু গল্পটির পরতে পরতে সেই মায়েরই অসহায়তা পরিদৃশ্যমান।

Society Language and Culture

কিশোরটি তার বাবার সঙ্গে শহর চক্রধরপুর থেকে আদিবাসী গ্রাম বালিডিহি যাচ্ছে পঞ্চাশ বিঘা জমির ধানের ভাগ নিতে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হিসেবেই কিশোরটির বাবা তার পিতামহের সম্পত্তি ভোগ করে। পূর্বে ওই গ্রামেই তিনি থাকতেন, শহরে উঠে এসেছেন সুযোগ সুবিধা বেশি বলে। তার মৃত্যুর পর কিশোরটির বাবা বছরে একবার গিয়ে ধানের ভাগ নিয়ে আসে। সম্প্রতি জমিগুলি ড্যামের কাজে লাগানোর জন্য সরকার বাহাদুর কিনে নিলেও ভাগচাষী নুনা সামাড তা জানেনা – 'অনুগত চিত্তে' ফসলের ভাগ দিয়েই চলে। নুনা সামাড কর্তব্যের খাতিরে, একরকম বাধ্য হয়েই কিশোর ও কিশোরটির বাবাকে সম্মান করলেও ঐ গ্রামের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের চোখে তারা 'কুমবু' অর্থাৎ 'লুটপাট করি পালায়, ধান-গোম-জোনহার-মোকাই – সব'। আর কিশোরটির কাকার লোক ঠকিয়ে খাবার ব্যবসা, সেভাবেই তার বাড়ি-গাড়ি।

গল্পটির একদিকে কিশোরটির স্বার্থপর শোষক শ্রেণির প্রতিভূ বাবা, চেরাবেড়া পাহাড়ের চেয়েও নিষ্ঠুর কাকা অন্যদিকে কিশোরটি নিজে ও তার মা। মা তার কাছে মহাভারতের আদর্শ স্ত্রী চরিত্রের অনেক ঊর্ধ্বে, আর তার বাবার কাছে ঘরের শত্রু বিভীষণ, মেয়েলি বুদ্ধির উইটিবি। কিন্তু মায়ের সামান্য প্রতিবাদী বিবেকী সংবেদনশীল কণ্ঠ আমাদের অন্যমনা করে চেতনার ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেয়।

কিশোরটির এই প্রথম বাবার সঙ্গে গ্রামে আসা। আসার সময় বেদনাহত স্বরে মা বলেছিল ঐ গ্রামেই তোর ঠাকুরদা থাকতো, সেখানেই তোদের দুই পুরুষের বাস। দুই পুরুষের ভিটেমাটিতে লোভের বশবর্তী হয়ে যেতেও কিশোরটির বাবার কঞ্জুসপনা লক্ষণীয়। মোরাম ফেলা পথে রিকশা ভাড়া অনেক, খরচ বাঁচাতে তাই সাইকেল সঙ্গে আনতে চাইলে কিশোরটির মা বারবার নিষেধ করলেও কর্ণপাত করে না বরং রেগে গিয়ে তার বাবা বলেছে,

> আয় তো করো না, টাকার মর্ম আর কি বুঝবে? টাকা যারা কামায় কেবল তারাই বোঝে টাকা কি জিনিস![৩]

কিশোর পরিমল বিরষা মুণ্ডাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে, সমর্থন পেয়েছে মায়ের। তাদের বাড়িতে কাজ করতে আসা আদিবাসী কাজের বুড়িটাকে তার মায়ের সহমর্মিতার চোখে দেখা পরিমলকে ভাবায়। বুড়ির তার বয়সী নাতি হাঁড়িয়া খেলে পরিমলের মা সমর্থন জানিয়ে বলে, 'হাঁড়িয়াই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই প্রচণ্ড গরমে আমপোড়া বা বেলের সরবত ওরা পাবে কোথায়? টকদই, ভূষি বা লেবুর সরবত তো ওদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে'। পরিমলের বাবা বুড়ির নাতির দোকান থেকে পাউরুটি তুলে পালানোর জন্য চোর অপবাদ দিলেও তার মা না মেনে নিয়ে অকপটে বলে, আমাদের দুর্ব্যবহার, ঘৃণা আর অবহেলাই ওদের এমন বিশৃঙ্খল করেছে। 'বিশৃঙ্খল' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অশিক্ষিত নুনা সামাডের থেকে পরিমলের শোষক পিতার এখন আর ধানের ভাগ নেওয়ার কথা নয়, জোরপূর্বক ফসলের ভাগ নিয়ে 'ছোট জাত', 'নিচু জাত' বলে চূড়ান্ত তিরস্কার ও গালিগালাজ করলে পরিমলের মা স্বামীর অন্যায় আচরণ মন থেকে মেনে নিতে পারে না,

> ও জমির উপর তোমার তো কোন হক্ নেই। যা দিচ্ছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। মানুষের বেশি লোভ ভালো নয়।[৪]

পরিমলের বাবার থেকে কাকা কোনো অংশে কম নয়, আদিবাসীদের যেনতেন প্রকারেণ ঠকানোই তার কাজ। এই ধূর্ত স্বভাবের কাজের জন্য সে চিরগর্বিত। কাকার এই চৌকস বুদ্ধিকে সমর্থন জানিয়েছে তার

Society Language and Culture

বাবা। কিন্তু দেবর আর স্বামীর এই বিবেকহীন প্রতারণা করার স্বভাবকে মেনে নিতে না পেরে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে কিশোরটির মা মৃদু ভৎসর্নার সুরে বলে, 'কাউকে ঠকিয়ে দিলে নিজেকেই ঠকতে হয় ঠাকুরপো। মনে রেখো, ভগবানের মার দুনিয়ার বার। তার কাছে কড়ায়-গন্ডায় লেখা থাকছে। সময় আসলে সুদে আসলে সব ফিরিয়ে দেবে'।

স্বভাবতই কিশোরের মা তার বাবা-কাকার বিরুদ্ধবাদী, ঘরের শত্রু বিভীষণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়মানুসারে পুরুষরাই পরিবারের, সমাজের মাথা; তাই নারীর কথা, নারীর স্বাভাবিক প্রতিবাদ কোথাও যেন হারিয়ে যায়। একই বাড়িতে থেকেও কিশোরটির মার বিবেকী আচরণ, শোষণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ করলেও সবের বিপরীতে মায়ের অসহায়তাই প্রকট করে দেয় ক্ষণে ক্ষণে।

'ফুলের দেশে ফুলপরী' গল্পটি একটু ভিন্ন স্বাদের। দেহপসারিণী বা দেহোপজীবিনীরাই এই গল্পের মূল উপজীব্য। স্টেশনের উল্টোদিকের ছোট ছোট ঘরগুলোতে তারা স্বর্গের মেনকা-উর্বশী-রম্ভার মতো পরপুরুষের মনোরঞ্জন করে। পারুল-কনক-চম্পা-ঝর্ণা-বিনতি হতভাগিনী বারবধূ, হারামির জীবন তাদের। পুরুষকে সুখ দেওয়াই তাদের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য, 'মেয়েমানুষের জন্ম হয়েছে পুরুষকে সুখ দেবার জন্য। এ তো অধর্ম নয়, এও এক পুণ্য। সবাই এ পুণ্যের ভাগীদার হতে পারে না'। অনেক পুণ্যের ভাগীদার, মানবিকতাবোধে উজ্জ্বল পারুল আজ ভাগ্যের ফেরে মৃত্যু পথযাত্রী। একজন খদ্দের তাকে এই মারণ রোগ উপহার দিয়ে গেছে। অনেক ডাক্তার, কোবরেজ করেও সুখলতা পারুলের রোগ নিরাময়ের কোন সুরাহা করতে পারিনি, বরঞ্চ জেনেছে এই মারণ রোগের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। পারুলের এই মারণ রোগের কথা জানাজানি হলে সুখলতার ব্যবসা চৌপট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই সবার চোখের মণি পারুলকে একজন বিষ খাইয়ে হত্যার পরামর্শ দেয়। কনক দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে তার অসময়ের সাথী পারুলকে নিজের রান্না ঘরে আশ্রয় দেয়, যথাসাধ্য সেবা-শ্রুশুষা করে। কার্তিক পুজোর রাত্রিতে পারুলের মৃত্যু হয়, গরমে পঁচে যাওয়ার ভয়ে ঘর থেকে মৃতদেহ খোলা আকাশের নীচে নামিয়ে রেখে যে যার মতো সে রাত্রে ব্যবসা করে যায়। পারুলের দেহ কেউই শ্মশানে নিয়ে যেতে চায় না, অনেক চেষ্টা করেও কোন পুরুষকে পাওয়া যায় না; তাই শেষমেষ বিরক্ত হয়ে সুখলতা বলেছে,

> চারটে মরদ পাওয়া যায় না একটা মেয়েকে ঘাটে নিয়ে যাবার জন্য? অথচ বেঁচে থাকতে ওরাই এই মেয়েটার পেছনে ভাদুরে কুকুরের মতো ঘুরঘুর করত।[৫]

নারীর এ অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না, হোক না সে বারবণিতা। যারা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পুরুষের মনোরঞ্জন করে চলত, সামান্য একটা অসুখে হটাৎ করেই মারা গিয়ে সে এতটাই অস্পৃশ্য! সত্যি ভাবতে অবাক লাগে আমাদের সমাজে নারীর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে! যে দেশে মরদ নেই সে দেশের মেয়েদেরও পিছিয়ে থাকলে চলে না। তাই পারুলকে ফুলের পোশাক পরিয়ে ফুলের বিছানায় শুইয়ে ফুলের দেশে পাড়ি দিতে হরিবোল ধ্বনি সহকারে কাঁধে চড়িয়ে রাস্তা কেটে রাস্তার ফুলপরীরাই শ্মশানে নিয়ে যায়। রেল বাজারের লোকগুলো দেখে ফুলপরীরা কারো চাইতে কোন অংশে কম যায় না। লেখকের কথায়, 'ওদের চোখে-মুখে হতাশা কিংবা পরাজয়ের কোনও চিহ্ন নেই। বরং ওরা হেমন্তের ভোরে ফোটা ফুলের চেয়েও স্বচ্ছ, তরতাজা'।[৬]

'টিকলি' গল্পে আদিবাসী ঝগড়ুর মাতৃহারা শিশুকন্যাকে 'টিকলি আমাদের মেয়ে নয়, মেয়ের মত' যত্নে ভালোবাসায় মানুষ করেছে রেলবাবু এবং তাঁর পত্নী পরমা। নিঃসন্তান পরমা পালোকে নিজের মেয়ের মতোই বড় করেছে, ভালোবেসে নাম রেখেছে টিকলি। সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে আজ কিশোরীতে পরিণত। ঝগড়ু এখন নিজের মেয়েকে ফেরত নিতে চায়, মেয়ের বিয়ে দেবে বলে। গ্রামের মুখিয়া একদিন টিকলির মাকে ভোগ করতে চেয়ে না পেরে ক্রোধান্বিত হয়ে ডাইনি অপবাদে পুড়িয়ে মেরেছিল; সেই মুখিয়ারই ছেলে লক্ষণের সঙ্গে টিকলির বিয়ে দিতে চায় ঝগড়ু সামান্য কিছু স্বার্থের জন্য। টিকলির বিনিময়ে সে লাভ করবে চারটে খাসি, দুটো হালের বলদ এবং নগদ হাজার টাকা। ঝগড়ুর উদ্দেশ্য সফল হয় না, টিকলিকে জোর-জবরদস্তি রাজি করিয়ে রেলবাবুর বাড়ি থেকে সে নিয়ে যেতে পারে না। এদিকে পালক পিতার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে মুখিয়ার ছেলে লক্ষণ ও তার বন্ধু বান্ধবের দ্বারাই নির্মমভাবে ধর্ষিত হয় টিকলি। থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয় না, উপরন্তু ঝগড়ু ও গ্রামের মাথা মুখিয়ার কৌশলে রেলবাবু তাঁর পত্নী ও টিকলিকে নিয়ে থানায় যেতে একপ্রকার বাধ্য হয়। পাকা লোক দারোগাবাবুর চক্রান্তে মুখিয়া ও তার ছেলে লক্ষণ টিকলিকে একরকম করায়ত্ত করেই ফেলে, 'বিচার হলো। বিচারে টিকলিকে ওরা নিয়ে গেল টেনে-হিঁচড়ে'। রেলবাবু ও তার পত্নী পরমা টিকলিকে শেষ বিদায় দিতে পারে নি। জোরপূর্বক ধর্ষক লক্ষণের সঙ্গে বিয়ে সে মানতে পারেনি, যেমনটি পারেনি তার মা চাঁদমনি গ্রামের মুখিরার অনৈতিক দাবিকে,

> গাঁয়ের মুখিয়াই হলো চাঁদমনির প্রথম দাবিদার। কিন্তু তার অন্যায় আব্দার নস্যাৎ করে দিল চাঁদমনি। তার কাছে মনুষ্যত্ব এবং ইজ্জত দুটোই দামী। এ দুটোকে সে হারাতে চায়না শত ঝঞ্ঝাটেও।[৭]

সম্মান এবং জীবন কোনটাই বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি চাঁদমনি, মুখিয়ার চক্রান্তে মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যায়। মায়ের মতোই একরকম সব শেষ হয়ে গেছে টিকলিরও কিন্তু কোথাও যেন মায়ের থেকে একটু আলাদা সে। বাবার মুখিয়াকে টাকা ফেরত দেওয়ার কথাকে সে মেনে নিতে পারে না, মাইজিকেও বারবার মেনে নিতে নিষেধ করেছে, 'খবরদার মাইজি, বাবার হাতে টাকা দিও না। মাতাল মানুষরা সরল হয় আর সরল কথায় ওরা মানুষের অনেক ক্ষতি করে। যে বাবা তার মেয়েকে মাত্র পাঁচশ টাকায় একটা লম্পট, চরিত্রহীনের হাতে বিক্রি করে দেয় - তার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া আদৌ উচিত নয়'। ঝগড়ুর কাকুতি-মিনতিতেও কোন কাজ হয় না, পরমাও দিশাহীন! কি করবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না টিকলিও, শেষমেষ ঘর থেকে খুঁজে ধর্ষণের চিহ্নযুক্ত রক্তমাখা শাড়িটা ছুঁড়ে দেয় বাবার মুখে। কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবাকে বলে,

> এতে যা রক্ত আছে সেই রক্তের দাম হাজার নয়, আরো অনেক বেশি। এই শাড়িটা তুমি মুখিয়ার ছেলেকে দিয়ে দিও। ... তাই আজ থেকে তুমি আর আমার বাবা নও, তুমি একটা জল্লাদ।[৮]

টিকলির কথায় আত্মদহন শুরু হয় ঝগড়ুর। ক্রমশ্য বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও মুখিয়ার নিরন্তর চাপ আর হাঁড়িয়ার নেশায় ক্রমশ হিম হয়ে যেতে হয় তাকে। মুখিয়া আর থানার দারোগার সহযোগিতায় ঝগড়ু জোরপূর্বক টিকলিকে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল মুখিয়ার ছেলের হাতে, অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে যায় এরপরই। দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর দিন স্বামী-শ্বশুরকে টাঙ্গী দিয়ে খুন করে নিজেও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করেছে পদে পদে।

Society Language and Culture

'টিকলি' গল্পের নারী চরিত্রেরা প্রায় সকলেই অসহায়। রেলবাবুর নিঃসন্তান স্ত্রী পরমা টিকলিকে অবলম্বন করে একটু বাঁচার রসদ পেলেও ভাগ্যের ফেরে তাকে হারাতে হয়েছে। টিকলির মা চাঁদমনির অসহায় পরিণতিও আমাদের ভাবায়। আর টিকলি হাজার চেষ্টা করেও নষ্ট হওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। শেষতক নিজের অপমানের প্রতিশোধ, মায়ের খুনের বদলে খুন করে নিজে আত্মহননের পথ বেছে নিয়ে নিজের অপবিত্র দেহটাকে মুক্তি দিয়েছে। থানার দারোগাও টিকলিকে শেষপর্যন্ত সম্মান না জানিয়ে পারেনি, 'মেয়েটার মধ্যে যে এত তেজ ছিল তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। যদি বুঝতে পারতাম তাহলে আমি ঐ লম্পটটার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিতাম না'। এখানেই টিকলির জয়।

'জার্মানের মা' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র রম্ভাধাই দেবত্বে অভিষিক্ত। গ্রামের 'ধাইমা' নামে সর্বজন পরিচিত রম্ভা ধাইয়ের স্বামী ফড়িং দাস মারা যাওয়ার পর একমাত্র ছেলে জার্মানকে নিয়েই তার অভাবের সংসার। দু'মুঠো খাবারের জন্য বাড়ি বাড়ি প্রসব করানোর কাজে গাঁময় অষ্টপ্রহর ঘোরে। কিন্তু ধাই বিদ্যেয় আজকাল আর পেট ভরে না, সবাই এখন হাসপাতালে ছোটে। ধাই বিদ্যে ছাড়াও তেল পড়া, জল পড়া আর ঝাড়ফুঁকে যা পায় তাতে একবেলা ভাত তো অন্যবেলায় আটা সিজা খেয়ে কোনমতে মা-ছেলের দিন চলে যায়। সামান্য এক চিলতে চাষের জমি নেই, এই বিদ্যেটুকুই তার একমাত্র আশা-ভরসা। কিন্তু সেই বিদ্যেয় এখন পচন ধরেছে। তার রুগ্ণ, শয্যাশায়ী ছেলে জার্মানের একমাত্র ভরসা তার মা-ই, রম্ভাধাই। গল্পটির পরতে পরতে স্বাভাবিক জীবনাচরণের জন্য রম্ভাধাইয়ের অসহায়তা পরিলক্ষিত।

হারা ঘোষ ফড়িং দাসের খুনি, আর্থিক স্বচ্ছলতায় সমাজে বেঁচে আছে প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে। রম্ভাধাই এবং জার্মান কোনোভাবেই তাকে পর্যুদস্ত করতে পারে না বরং বিপর্যস্ত হয় পদে পদে। অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর জোগার, অন্যের কাছে হাত পাততেও তার শরমে লাগে! তাই হাটবারে ঝুড়ি ভর্তি কলমি শাক নিয়ে হাটে যায়, তবে ধান ওঠার সময়ে সে আর হাটে যেতে পারে না। তখন তার দু'হাত ভরা কাজ। এই চিরন্তনী অসহায় মা জার্মানের অসুখ সারানোর জন্য বেনে বাড়িতে পেতলের হাড়ি-কুড়ি, থালা-বাসন বাঁধা দিতেও পিছপা হয় না, ছেলের জীবনের কাছে পেতলের বাসন-কোসন অতি তুচ্ছ। গল্পের একেবারেই শেষে রম্ভাধাই চিরশত্রু, অসহায় সাহায্যপ্রার্থী হারা ঘোষের আঁটকুড়া নাম ঘোচাতে তার বউয়ের বাচ্চার জন্ম দিয়ে, হারা ঘোষের সমস্ত সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যুমুখী সন্তানের কাছে ফিরে আসলে তার একমাত্র সন্তানের কাতর উচ্চারণ,

> মা-রে, তোরে আমি ঠাকুর ভাবতাম-আজ তুই আমার কাছে মাটির ঢেলা। যার শরীরে রাগ নেই, ঘেন্না নেই সে মাটির ঢেলা ছাড়া আর কি হয়?[৯]

'জার্মানের মা' গল্পের পটভূমি আমাদের চিরপরিচিত বাঙালি নারী হৃদয়ের মাতৃসত্তাকে চিনিয়ে দেয়। ধাইমার কাজ নিয়ে জার্মানের মা এদেশের গ্রাম নির্ভর নিম্নবিত্ত প্রান্তিক সমাজের জীবনাচরণের অসহায়তাকেই তুলে ধরেছে অনুপম চিত্রলিপিতে।

'বীজ' গল্পে গ্রামের মাথা মুখিয়া চায়না গ্রামে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করুক। তার ছেলে গ্রামের স্কুলের মাস্টার তবুও সে স্কুলে যায় না। বাবা-ছেলে মিলে গ্রামের হতদরিদ্র মানুষদেরকে চিরকাল অশিক্ষিত করে রাখতেই চায়, সেখানেই তাদের লাভ। সরকারি তরফে উচ্চফলনশীল ধানের বীজ দিলেও মুখিয়ার কৌশলে

Society Language and Culture

ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সকলে তার থেকেই চড়া সুদে বীজ নিয়ে চাষা-আবাদ করতে একপ্রকার বাধ্য হয়। গমিয়া যথাসম্ভব চেষ্টা করেও তাদের বোঝাতে অপারগ। হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকারি উচ্চফলনশীল ধান বীজ দিয়েই চাষ করে সে। একারণে গমিয়া-টুনিয়াকে একঘরে হতে হলেও তারা কোনভাবেই মুখিয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করেনা। তাদের খেতের উৎপন্ন ফসল সবার ঈর্ষার উদ্রেক করে, একটু একটু করে সবাই নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারে! শেষতক এতসব সহ্য করতে না পেরে মুখিয়া সামারুবুড়ার সাহায্যে গমিয়াকে খুন করতে গিয়ে, সামারুবুড়ার কৌশলে নিজেই মারা যায়। সামারুবুড়া শেষতক মেনে নিতে পারিনি মুখিয়াকে, সেও আন্তরিক ভাবনায় গমিয়ার শরিক হয়েছে। গমিয়ার উপলব্ধি অসাধারণ,

> আসলে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার বড় অভাব রে! যতদিন না পেটে কালো কালির আঁচড় পড়ছে ততদিন আমাদের এই অবস্থা ঘুচবে না ...[১০]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত মেয়ে টুনিয়া মরদ গমিয়ার মতোই উপলব্ধি করেছে শিক্ষার অভাবকে। অসহায় আক্ষেপ করা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই। নিজের ছেলে দুটোকে আন্তরিকভাবে পড়াতে চেয়ে স্বামী গমিয়াকে বলেছে, 'গাঁয়ের ইস্কুলে মাস্টার আসেনা, তুমি একবার বেডিও আপিসে গিয়ে বলবে তো'। গমিয়া নদীর উপর বাঁধ তৈরির জন্য 'এমলে সাহেবের' কাছে গণ দরখাস্ত দিতে চেয়েও ব্যর্থ হয় মুখিয়ার বিরোধিতায়। তখনো গ্রামের অসহায় প্রান্তিক মানুষগুলোর কথা শুনে টুনিয়ার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলেও অসহায় খেদ প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকেনা, 'ওরা চায় সবাই মূর্খ হয়ে থাকুক। ওদের পায়ের নিচে থাকুক'। সবাই থাকে না পায়ের নিচে, কিছু জন থাকে; তারমধ্যে গমিয়া-টুনিয়া পড়ে না। তাই গমিয়ার যোগ্য সহযোগী শক্তি টুনিয়া, অর্ধেক আকাশ, উন্নয়নের শক্তিশালী হাতিয়ার, 'তুই আমার দেহের তাগত, তুই আমার পাশে থাকলে আমি আর কাউকে ডরাই না'। প্রান্তিক অসহায় নারীর জয়জয়কার এখানেই।

'পরিযান' গল্পের ময়না, 'বিলভাত' গল্পের পুতলি, 'গোলাপগাছ' গল্পের সারী চরিত্রের মধ্যে স্বামীর অবর্তমানে তাদের দুর্দমনীয় অসহায় অবস্থার চিত্র প্রকটিত উঠেছে। ময়নার বিয়ে হয়েছিল জাঁকজমক করে ভালো পরিবারে, তার কোন অন্যায়ও ছিল না। বিয়ের পর পাঁচশ টাকা জামাইকে দেওয়ার কথা ছিল তার বাবার কিন্তু হটাৎ করেই বাবা মারা যাওয়ায় সেটা আর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই বাপ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকেও বাপের ঘরে ফিরে আসতে হয় কোনরকম প্রতিবাদ ছাড়াই। বাপের ঘরে এদিক-ওদিক গতর খাটিয়ে সংসার চালাতে হয় তাকে। কিন্তু সোমত্ত মেয়ের একা থাকাটাও চাপের ব্যাপার, সবাই সুযোগ খোঁজে কিন্তু 'ফাঁকা মাঠের হাওয়ার মতো সে যে সবার জন্য নয় – একথা সে কাউকে বোঝাতে পারল না'। সে মন থেকেই ছিল মুচিয়ার, কিন্তু পালকিহীন মুরুব্বির মতোই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মুচিয়া-ময়নার প্রেম। বর্তমানে মুচিয়ার যা অবস্থা তাকে পেয়েও সম্পূর্ণ করে পেয়ে ওঠা হয় না ময়নার। 'বিলভাত' গল্পের পুতলি বড় ঘরের বউ, স্বামী মারা যাওয়ার পর 'অপয়া'র অজুহাতে শাশুড়ি তাকে খেদিয়ে দিয়েছে শাঁখা ভেঙে। অগত্যা বাপের বাড়িতে এসে উঠতে হয়েছে তাকে। তারপর ঝি'গিরি, ভিক্ষে। সহায়সম্বলহীন পুতলির নিজের বলতে কেউ নেই, শুধু আছে গোখরো সাপের মতো রাগ। অসহায় প্রান্তিক নারীর রাগ থেকেই কি লাভ? ঝি'গিরি, ভিক্ষে করেই কোনোমতে তাকে দিন অতিবাহিত করতে হয়। 'গোলাপগাছ' গল্পের সারী হালে বিধবা হয়েছে, ছেলেপুলে নেই, যেন 'সাদা শাড়িতে জল দাবানো রাজহংসী'। রাজহংসী রূপের মোহেই সে অন্যকে মোহিত

Society Language and Culture

করে জীবন কাটাতে চেয়ে এক এক করে গুলাপ চোর, গঞ্জের চালবেপারীর সঙ্গে ঢলেছে, 'মানুষজীবন ফুর্তি করার জন্য। আমরা দু'দিনের জন্য মুসাফির ছাড়া তো আর কিছু নই! যেদিন আল্লার ডাক আসবে সেদিন কবরের মাটি আপনা-আপনি সরে যাবে'। অসহায় প্রান্তিক নারীর এই জীবনবোধ চমকে দেওয়ার মতো কিন্তু অচিরেই সব শেষ হয়ে যায়। লোভই একরকম তাকে শেষ করে দিয়েছে, এখন ইঁদুরের গর্ত থেকে ধানের শিস বের করে কোনমতে করেকর্মে খায়। তার বর্তমান অবস্থা এতই অসহনীয় যে গুলাপকে সবচাইতে ভালোবাসতো তাকেই কাছে আসতে বারণ করেছে 'আমার শরীলে কুঁড়ি ফুটেছে, তুমি আমারে আর ছুঁয়ো না'। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস এমনই।

'কাকমারা' গল্পের পার্বতী, 'পিঁপড়ের জীবন' গল্পের টগর, 'পুনশ্চ পরশুরাম' গল্পের সুনার ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে অসহায়। প্রান্তিক সমাজের নারী হিসেবে এই অসহায়তা নিজের দিক থেকে যেমন আবার তা সামগ্রিকভাবেও। 'কাকমারা' গল্পের পার্বতী সম্পূর্ণতই অসহায়। সামান্য কিছুও সাধ তার পূরণ হওয়ার নয়। তার স্বামীর পেশা কাক মারা। ফাঁসজালে কাক মারতে গিয়ে একটা ময়না পাখি পেলে পার্বতী তাকে পুষতে চেয়েছিল, 'ইটা আমি পুষব। ময়না পাখি সুখের চাবি গো-'। কিন্তু সংসারচক্রের নিদারুণ অভিঘাতে পূরণ হয়নি তার ময়না পাখি পোষা। পিতার দেখানো পথে হেঁটে, পিতার অসুখের জন্য পয়সা সংগ্রহ করতে পার্বতীকেই ভিক্ষাস্বর বাধা দিতে বাধ্য হয়েছে মহাজনের কাছে। পিতা তার মাকে মহাজনের কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় ফেরত আনতে না পারলেও ভিক্ষাস্বর পিতার জমানো টাকায় পেয়ারের বহুকে ছাড়াতে গিয়ে তার শোচনীয় অবস্থা দেখে ভীরমি খেয়েছে। কী করা উচিৎ ঠিক করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ ফাঁসজালে মহাজনকে আটকে তাকে হত্যা করে অসহায় পার্বতীকে স্বগৃহে ফিরিয়ে এনেছে। 'পিঁপড়ের জীবন' গল্পের টগর সবদিক থেকেই অসহায়। নিজের বাপ বুড়ো বয়েসে একটা বেধবা মেয়েটাকে বিয়ে করলে সে হয়ে উঠেছে তাদের গলার কাঁটা। কাজেই বাবার সংসারে আগাছার মত সে বাঁচতে না চেয়ে যাকে বিয়ে করেছে সেই সাধনের পেশা হলো পিঁপড়ের বাসা ভেঙে পিঁপড়ের ডিম সংগ্রহ করা। এই বাসা ভাঙা কাজটাকে টগর কোনমতে মেনে নিতে পারে না, নিজের প্রথম গর্ভ ঝরে যাওয়ার পর তো নয়ই। কিন্তু তারা অসহায়, দুজনের কারোরই কিছু করার থাকে না। পার্বতী না পেয়েছে স্বামী সুখ, না পেয়েছে একটা পরিপূর্ণ সংসার। তার মাতৃত্বও পূর্ণ হয়নি, সাধনকে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সে বলেছে,

> এবারের ডিম বেচার পয়সায় তুমি আমারে পীরবাবার মাদুলি এনে দিয়ো'খন। শুনেছি পীরবাবার কাছে মানত করলে কোলভারি হয় মেয়েদের। আমার মন বলছে গো, আবার আমি মা হব।[১১]

পার্বতীর এই সাধ পূর্ণ হয়েছে কিনা আমরা জানি না, তবে সাধন অন্যের বাসা ভাঙার কাজটা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে নতুন করে নিজের বাসা গড়তে চেয়েছে। 'পুনশ্চ পরশুরাম' গল্পের সুনার প্রান্তিক অসহায় নারী হিসেবে স্বামী ভীষনাথের কর্তৃত্বকে পুরোপুরি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। একমাত্র অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করার জন্য বারবার হাসপাতলে নিয়ে যেতে চেয়েও সে অপারগ, 'কতদিন হয়ে গেল তবু জ্বর ছাড়চে নে - আমার মাথায় কিছু ঢুকচে না! ওগো কালই তুমি ছেলেরে নিয়ে হাসপাতালে চলো। আর গুনিন-কোবরেজ দেখানো ঠিক হবে না'। শেষতক সুনার সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করতেই পারেনি। কাজেই যা হওয়ার, তাদের একমাত্র ছেলে একরকম বীণা চিকিৎসায় লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারে মরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

Society Language and Culture

প্রখর বাস্তববাদী, মানবদরদী লেখক শব্দের ছবিতে নিচুতলার মানুষদের চিত্রায়িত করতে ভালোবাসতেন, করেছেনও তাই। মানুষের কাছে যাওয়াই ছিল তাঁর প্রিয় সখ। সেটা করতে গিয়ে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল বা দলিলের প্রতি তিনি দাসখত লিখে দেননি। তাঁর একমাত্র অঙ্গীকার মানুষগুলোর প্রতি। সেই মানুষগুলি, যাঁদের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন –'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না ...'। এই প্রান্তিক, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষগুলির চরিত্র সুনির্দিষ্ট আবেগ অনুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্প বিশ্বে। সেদিক থেকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল, নারী চরিত্রগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রান্তিক অসহায় নারীর যে সব চালচিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অত্যন্ত অভিনব, বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে; গল্পকারের মানবিকতার উত্তুঙ্গ স্পর্শে তারা চিরকালীন।

উৎসের সন্ধানে।। অনিল ঘড়াইয়ের ছোটগল্পে প্রান্তিক নারীর অসহায়তা

১. তাপস ভৌমিক (সম্পাদনা), 'কোরক', এই সময়ের অন্য ধারার উপন্যাস, প্রাক শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ২০৫।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।

৩. অনিল ঘড়াই, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'নুনা সামাডের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৯।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৫. অনিল ঘড়াই, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'ফুলের দেশে ফুলপরী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৮১।

৬. পূর্বোক্ত,পৃ. ১৮১।

৭. অনিল ঘড়াই, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'টিকলি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২৮।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১।

৯. অনিল ঘড়াই, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'জার্মানের মা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৮০।

১০. অনিল ঘড়াই, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'বীজ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৮৯।

১১. অনিল ঘড়াই, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'পিঁপড়ের জীবন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৩৩।

সহায়ক গ্রন্থতালিকা

ক।। আকর গ্রন্থ :

১. অনিল ঘড়াই, 'পরীযান ও অন্যান্য গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

২. অনিল ঘড়াই, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬।

খ।। সহায়ক গ্রন্থ :

১. ইন্দ্রানী চক্রবর্তী, 'বাংলা ছোটগল্প প্রকরণ ও প্রবণতা', রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৪।

২. তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা ছোটগল্পের দিগবলয়', ভাষা ও সাহিত্য পাবলিশিং, ২০০৬।

৩. পবিত্র সরকার, 'লোকভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯১।

Society Language and Culture

৪. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯। ৫. রবিন পাল, 'ছোটগল্পের বিন্দুবিশ্ব', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩।

৬. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫।

৭. শ্রাবণী পাল, 'পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা (১৯৭৭-২০০০)', 'গল্পকারের ভাবনা', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

৮. সুমিতা চক্রবর্তী, 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪।

৯. সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭।

১০. সুস্নাত জানা ও সুনীল মাজি (সম্পাদিত), 'প্রসঙ্গ অনিল ঘড়াই', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪।

গ।। সহায়ক পত্র–পত্রিকা :

১. 'কোরক', তাপস ভৌমিক (সম্পাদনা), এই সময়ের অন্য ধারার উপন্যাস, প্রাক শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১৫।

২. শাশ্বত ছিন্নপত্র, 'অনিল ঘড়াই সংখ্যা', বালিঘাই, মেদিনীপুর, ২০০৪।

৩. সৃজন, 'ছোটগল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা', ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৩।

৪. সৃজন, 'অনিল ঘড়াই বিশেষ সংখ্যা', ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৪।

Society Language and Culture